বুদ্ধের রাজনৈতিক দর্শনে রাজার ভূমিকা

বলরাম করণ

সারাংশ : গৌতম বুদ্ধের দর্শন মুখ্যতঃ চরিত্রনীতি-মূলক। মানুষকে দুঃখ নিবৃত্তির পথের সন্ধান দেওয়াই ছিল তাঁর লক্ষ্য। তিনি মনে করেন, নিছক তত্ত্ব আলোচনায় মানুষের দুঃখের নিবৃত্তি হতে পারে না, নৈতিক চরিত্র গঠনের মধ্য দিয়েই একমাত্র দুঃখের নিবৃত্তি সম্ভব। মানুষ কাম, ক্রোধ, লোভ ও মোহের পঙ্কিল আবর্তে আবর্তিত হয়ে অশেষ দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে চলেছে। নিত্য কলহ, হানাহানি মানুষের নিত্যসঙ্গী। মানুষ যাতে সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে পারে তারজন্য একজন ন্যায়পরায়ণ সুদক্ষ প্রশাসকের প্রয়োজনীয়তা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। এই প্রশাসককে 'রাজা' বলে সম্বোধন করা হত। আবার কখনো কখনো এই রাজাকে 'মহাসম্মত' কিংবা 'ক্ষত্রিয়' নামেও ডাকা হত। এই রাজা ছিলেন ন্যায়ের প্রতিমূর্তি। তিনি জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের প্রতি সম মনোভাব পোষণ করতেন। তিনি একদিকে যেমন শিষ্টের পালন করতেন, তেমনি কঠোর হস্তে দুষ্টেরও দমন করতেন। তবে রাজা কখনো কোনো অপরাধীর মৌলিক অধিকারকে হরণ করতেন না। রাজা অপরাধীদের ঘৃণার চোখে না দেখে বরং বুদ্ধের প্রদর্শিত পথে তিনি তাদেরকে পাপের পঙ্কিল গহ্বর থেকে সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনতেন। এদিক থেকে রাজার মানবিক গুণেরই পরিচয় পাওয়া যায়। যুদ্ধে জয় অপেক্ষা প্রজাদের হৃদয় জয় করার মধ্যে যে মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব আছে তা সম্রাট অশোক তাঁর নিজের জীবন দিয়ে দেখিয়ে গেছেন। যিনি রাজ্যাভিষেকের সময় ক্ষমতার মোহে অন্ধ হয়ে যে রক্তনদী বইয়ে দিয়েছিলেন, তিনিই পরবর্তীকালে বৌদ্ধধর্মের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে সাম্য, মৈত্রী ও করুণা-ধারা দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। এইভাবে রাজ্যবিস্তারের কামনা ত্যাগ করে বহুজন হিতায়ে এবং বহুজন সুখায়ে নিজেকে সর্বদা ব্যাপৃত রেখে যে অনন্য কীর্তি স্থাপন করে গেছেন তা আজও পাঠককে বিস্মিত করে। কাজেই, বলা যায় অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনই যে রাজার একমাত্র কর্তব্য নয় বরং দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করা, মানবাধিকার রক্ষা করা এবং অপরাপর সকল বর্ণ, জাতি ও ধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতা ও সম মনোভাব প্রদর্শন করাও যে রাজার প্রধান কর্তব্য তা সুচারুভাবে প্রতিফলিত হয়েছে এই প্রবন্ধে।

বীজশব্দ: সাম্য, মৈত্রী, করুণা, ন্যায়পরায়ণতা, কুশলকর্ম, রাজধর্ম, ধর্মরাজ্য, লোকহিত, দানশীলতা, প্রজাবৎসল মানসিকতা।

বৌদ্ধ সাহিত্যে রাজকার্য সুচারুরূপে পরিচালনার ব্যাপারে রাজার ভূমিকা, রাজার নৈতিক দায়বদ্ধতা বিষয়ে বিভিন্ন আলোচনা পাওয়া যায়। রাজনীতি বিষয়ে বৌদ্ধশাস্ত্রে যে সচেতনতা লক্ষ্য করা যায়, তা আমাদের বিস্মিত করে। পাশ্চাত্য রাজনৈতিক তত্ত্বের আলোচনার বিভিন্ন আলোচ্য প্রশ্নের মধ্যে অন্যতম প্রশ্ন, কেন আদৌ রাষ্ট্র গঠিত হয়েছিল? হবস্, লক ও রুশো এই তিনজন ব্যক্তিত্বের নাম রাষ্ট্রের উৎপত্তি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সামাজিক চুক্তি নামক তত্ত্বের উদ্ভাবক ও প্রণেতারূপে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আজ থেকে প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগেও ভারতবর্ষের মাটিতে ওই জাতীয় প্রশ্ন অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হচ্ছে দেখলে আশ্চর্যান্বিত হতে হয়।

প্রেক্ষাপট: একনায়কতন্ত্র অথবা গণতন্ত্র কোন্‌টি আদর্শ শাসনব্যবস্থারূপে গৃহীত হবে এই বিষয়ে বিস্তর আলোচনা হয়েছে। বহুক্ষেত্রে একনায়কতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বর্জন করে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা আধুনিক যুগের অন্যতম অবদান। গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িক কালে একনায়কতন্ত্র বা রাজতন্ত্রেরই প্রচলন ছিল যেখানে রাজাই সর্বেসর্বারূপে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। তিনি ছিলেন আসনের রক্ষক ও প্রতিপালক। প্রশাসনিক কার্যে অন্যান্য মন্ত্রী ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা থাকলেও রাজাই ছিলেন সর্বেসর্বা। তবে তিনি সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হলেও, রাজা ক্ষমতার অপব্যবহার করবেন— এমন আকাঙ্খিত ছিল না। বিশুদ্ধিমার্গ এবং দীঘনিকায়[১] এর অন্তর্গত অগ্‌গঞ্ঞ সুত্ত -এ উল্লেখ আছে সৃষ্টির আদিতে রাজা বলে কোন প্রশাসক ছিল

না। আদিতে পাহাড়-পর্বত, সাগর-মহাসাগর প্রভৃতির পরে পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব হয়। সেই সময়কার মানুষের মন ছিল শুদ্ধ-পবিত্র, তাদের জীবনযাত্রা ছিল সহজ-সরল ও অনাড়ম্বর। তাদের মধ্যে কোন প্রকারের বাদ-বিসম্বাদ ও পারস্পরিক ভেদাভেদ ছিল না। কিন্তু কালের অমোঘ নিয়মে বিবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিম্নতর খাদ্য শস্য থেকে ক্রমশঃ উচ্চতর খাদ্য শস্য, এমনকি ধান ফলতে শুরু করল। এইসমস্ত খাদ্য শস্য খেয়ে তারা জীবনধারণ করতে লাগল। কিন্তু তাদের দৈহিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে চারিত্রিক ও মানসিক বিকাশ ক্রমশঃ নিম্নগামী হতে শুরু করল। এবং যখন থেকে তারা যৌন চেতনা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠল, তখন থেকে তারা বসবাসের উপযোগী পৃথক পৃথক বাড়ি ঘর বানাতে শুরু করল। তারপর তারা জমির নির্দিষ্ট গণ্ডি টেনে জমিগুলিকে নিজেদের মালিকানাধীন করেছিল এবং সেইসকল জমিতে ফসল ফলিয়ে নিজেদের জন্য খাদ্য সংগ্রহ করে জীবনধারণ করতে লাগল। যখন থেকে জমির মধ্যে এইরকম নির্দিষ্ট গণ্ডি টেনে দেওয়া হল, তখন থেকে তাদের মধ্যে লোভ, মোহ জন্মাতে শুরু করল। তারা লোভের বশবর্তী হয়ে অন্যের জমি-জায়গাকে নিজের বলে দাবি করতে লাগল। তখন থেক তাদের মধ্যে বাদ-বিসম্বাদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠল এবং সমাজে নানান বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। ফলে সমাজে অপরাধ প্রবণতা চরম আকার ধারণ করেছিল। প্রথমে যে দোষ করত, তৎক্ষণাৎ তার দোষ দেখিয়ে সেই অপরাধ থেকে তাকে নিবৃত্ত করা হত। কিন্তু সে শীঘ্রই তা ভুলে যেত এবং আবার ঐ একই অপরাধে জড়িয়ে পড়ত। ফলে তার ঐ কৃতকর্মের জন্য সে শাস্তি পেত। এইভাবে চৌর্য প্রবৃত্তি, মিথ্যাচার, পরনিন্দা ও হিংসা এই চারপ্রকার কু-প্রবৃত্তি সমাজে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। সমাজের এই উচ্ছৃঙ্খল অবস্থা দেখে সকলেই ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল এবং এর থেকে তারা পরিত্রাণের পথ খুঁজতে লাগল। ত্রাতা হিসাবে এমন একজনকে নির্বাচিত করতে চেয়েছিল যে কিনা সুন্দর-সুদর্শন দেখতে হবে এবং যে সুদক্ষ, নিরপেক্ষ ও জনদরদী প্রশাসকরূপে সকলের হৃদয় জয় করবে। তারা সেই আদর্শবান পুরুষের নাম দিয়েছিলেন 'রাজা'। যে রাজা রাজ্যের অধিপতি ও সমস্ত মানুষের সুখ-দুঃখের সাথী। যেহেতু জনতা তাকে নির্বাচিত করত, সে হেতু তাকে 'মহাসম্মত' নামেও ডাকা হত, আবার যেহেতু তিনি জমির রক্ষাকর্তা ছিলেন সেহেতু তাঁকে 'ক্ষত্রিয়' নামেও ডাকা হত। আবার যেহেতু তিনি মানুষকে ধর্মের পথে পরিচালিত করে সুস্থ-সুন্দর-জীবন-যাপনে উৎসাহিত করতেন, সেহেতু তাঁকে 'রাজা' বলে সম্বোধন করা হত। বিশেষতঃ দেশনায়ক বা শাসনকর্তাকে বেশিরভাগ সময়ই 'রাজা' বলেই ডাকা হত।

বৌদ্ধ সাহিত্যে রাজার উদ্ভব ও প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে যে বিবরণ আমরা পাই, তার সাথে প্রচলিত পাশ্চাত্য মতের বহুক্ষেত্রে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। উল্লিখিত বৌদ্ধ সাহিত্যের অংশ বিশেষে প্রচ্ছন্নভাবে এক ধরনের বিবর্তনবাদের ইঙ্গিত লক্ষ্য করা যায়। ভারতীয় দর্শন বিবর্তনবাদ সমর্থন করে কিনা এই বিষয়ে মতপার্থক্য আছে, তাই বৌদ্ধদর্শনে বিবর্তনবাদ সুলভ মতের জ্ঞাপন কিভাবে সমর্থিত হতে পারে এই প্রশ্ন জাগে। তবে উক্ত বিষয় বর্তমান প্রবন্ধের আলোচনার বাইরে।

রাজার উত্থান বা প্রয়োজনীয়তা: উলুক জাতকে ও রাজার উৎপত্তি বা উত্থান সম্বন্ধে একটি সুন্দর বর্ণনা আছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, একদা মানুষ একসঙ্গে মিলিতভাবে বসবাস করত। কিন্তু যখন থেকে তারা লোভের বশবর্তী হল, তখন থেকে তাদের মধ্যে ব্যবধান ক্রমশঃ বাড়তে থাকল। একে অন্যের থেকে আলাদা হয়ে বিচ্ছিন্নভাবে জীবন-যাপন করতে লাগল। ফলে চাওয়া-পাওয়া নিয়ে তাদের মধ্যে বাদ-বিতণ্ডা, সংঘর্ষ লেগেই থাকত। অপরাধপ্রবণতা ক্রমশঃ মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। উক্ত সমস্যার সমাধানের জন্য একজন সুদক্ষ, বিচক্ষণ ও আদর্শবান রাজার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। যার অনিবার্য ফলরূপে 'রাজা' নির্বাচিত হয়েছিল।

আমরা যদি গভীরভাবে পর্যালোচনা করি, তাহলে দেখতে পাব রাজার উৎপত্তির পিছনে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ কারণ আছে, সেগুলি নিম্নে আলোচনা করা হল—

প্রথমতঃ, রাজার কাজ ছিল নৈরাজ্যমূলক অবস্থাকে প্রতিহত করা। চৌর্য প্রবৃত্তি, মিথ্যাচার, গালমন্দ বা নিন্দাবাক্য ও হিংসা এই চতুর্বিধ কুকর্ম সমাজে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। এইরকম অবস্থায় একজন সুদক্ষ, যোগ্য ও আদর্শবান শাসনকর্তা ছাড়া উক্ত অরাজকতাকে বা কুকর্মগুলিকে প্রতিহত করা সম্ভব ছিল না। সেইজন্য উক্ত বিশৃঙ্খলা তথা অরাজকতাকে শক্ত হাতে প্রতিহত করতে 'রাজা' নির্বাচিত হয়েছিলেন।

দ্বিতীয়তঃ, কোন একজনের পছন্দ-অপছন্দ অনুসারে রাজা নির্বাচিত হতেন না। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের সম্মতির ভিত্তিতে রাজা নির্বাচিত হতেন। এইজন্য রাজাকে বলা হত 'মহাজনসম্মত', যাঁকে আরও সহজ করে বলা হত 'মহাসম্মত'। এর দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, রাজা গণতান্ত্রিক পদ্ধতির দ্বারা নির্বাচিত হতেন। রাজা যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের সম্মতি না পেতেন, তাহলে তিনি নির্বাচিত হতেন না।

কিন্তু বৌদ্ধদর্শনে যে রাজার পরিচয় পাই তিনি জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হয়ে একদিকে যেমন ব্যক্তির সম্পদকে রক্ষা করতেন, তেমনি সমষ্টির সম্পত্তিকেও রক্ষা করতেন। ধর্মসূত্রের এক জায়গায় বলা হয়েছে, রাজা যেখানে বসে রাজকার্য পরিচালনা করতেন, সেই কার্যালয় ছিল সর্বসাধারণের কাছে রক্ষাকবচ বা নিরাপদ স্থান।

রাজার গুণাবলী বা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য: সমাজের অন্যান্য সদস্যদের তুলনায় রাজাই ছিলেন উৎকৃষ্ট গুণাবলীর অধিকারী। *সুত্তনিপাত* [২] এ বলা হয়েছে—রাজাই ছিলেন সমাজের অগ্রগণ্য, আবার *সংযুক্তনিকায়* [৩] এ রাজাকে রাষ্ট্রের পঞ্ঞানম্ (pannanam) নামে অভিহিত করা হয়েছে। আবার *বিভঙ্গতে* [৪] রাজাকে ঈশ্বরের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। তবে অর্হৎরা রাজার ঐশ্বরিক গুণের তুলনায় ছিলেন উচ্চস্তরের। রাজা 'ঈশ্বর' বলে অভিহিত হন, যেহেতু তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের সম্মতি অনুসারে নির্বাচিত হন। তাই তাঁকে 'সম্মতিদেব'-ও বলা হয়। অন্যদিকে অর্হৎরা দেবতা বলে অভিহিত হয় তাদের চারিত্রিক ও মানসিক শুদ্ধতার জন্য। তাই তাদেরকে 'বিশুদ্ধিদেব'-ও বলা হয় এবং বুদ্ধরা 'উপপত্তিদেব' জন্মের দ্বারা ঈশ্বর বলে অভিহিত হয়।

প্রশ্ন ওঠে : এমন কি কোনও বিশেষ বা মহৎ গুণ আছে, যার দ্বারা রাজাকে সমাজস্থ অন্যান্য মানুষ থেকে আলাদা করতে পারি? উত্তরে *দীঘনিকায়*-এর অন্তর্গত অগ্গঞ্ঞ সুত্ত (Agganna-Sutta) তে বলা হয়েছে— রাজা সুন্দর হবেন, সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপনে নিজের দক্ষতার পরিচয় দিতে পারবেন এবং যিনি খুব সহজে অন্যের মনকে জয় করতে পারবেন সেইরকম মন মুগ্ধকর আদর্শবান ব্যক্তিই 'রাজা' বলে অভিহিত হবেন। রাজার আর একটি মহৎ গুণ হল তিনি খুব উদার ও জনদরদী হবেন। রাজা যদি সংবেদনশীল না হন, তাহলে সাধারণ মানুষ কোনকিছু সহজে ও অকপটে বলতে পারবে না।

মিলিন্দপনহা নামক বইতে রাজা মিলিন্দ এবং ভিক্ষু নাগসেনের মধ্যে যে কথোপকথন হয়েছিল, সেখানে রাজা মিলিন্দের যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে তা নিম্নে আলোচনা করা হল—

১) রাজা তাঁর রাষ্ট্রে জনকল্যাণমূলক আইন-কানুন প্রণয়ন করে সঠিকভাবে রাজকার্য পরিচালনা করবেন।

২) একজন রাজা সাধারণ মানুষের সুখে যেমন উল্লসিত হবেন, তেমনি দুঃখেও কাতর হবেন।

৩) রাজা তাঁর দেশের অগ্রগতিকে আরও উর্ধ্বে নিয়ে যাওয়ার জন্য নিবেদিত-প্রাণ হবেন।

৪) তিনি যশ, খ্যাতি ও প্রতিপত্তির অধিকারী হবেন।

৫) তিনি আপামর জনসাধারণের আনুগত্য পাওয়ার যোগ্য হবেন।

৬) রাজা যখন কোন ব্যক্তির কাজে সন্তুষ্ট হবেন, তখন তিনি সেই ব্যক্তির পছন্দ অনুসারে দামী জিনিস উপহার দিবেন।

৭) পূর্বতন ন্যায়পরায়ণ রাজারা সেইসময় যেভাবে আইন-কানুন প্রণয়ন করেছিলেন, ঠিক তেমনি বর্তমান রাজাও সেইসমস্ত

নিয়মগুলিকে যথাযথভাবে প্রণয়ন করবেন এবং ভবিষ্যতেও সেই নিয়ম বহন করার বার্তা রেখে যাবেন।

৮) উক্ত পারদর্শিতার জন্য রাজা আমজনতার কাছে শ্রদ্ধাবান ও প্রিয়পাত্র হিসাবে বিবেচিত হবেন।

৯) রাজার চারিত্রিক শুদ্ধতা ও ন্যায় পরায়ণতার জন্য সুদীর্ঘকাল রাজবংশের অস্তিত্ব রক্ষা পাবে।

নাগার্জুন তাঁর *'রত্নাবলী'*-তে রাজাকে একটি সমৃদ্ধ গাছের সঙ্গে তুলনা করেছেন— গাছের ফুলগুলি যেমন অন্যকে তার সুবাস ও সৌন্দর্য্য প্রদর্শনের জন্য প্রস্ফুটিত হয়, ঠিক তেমনি রাজা ও অন্যের বা সমাজের সুখের জন্য রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। এবং গাছ যেমন ছায়া দিয়ে মানুষকে সূর্যের প্রখর রোদের হাত থেকে রক্ষা করে, ঠিক তেমনি রাজাও তাঁর দয়া, সহিষ্ণুতা, তিতিক্ষা দ্বারা বিপথগামী মানুষকে সুপথে পরিচালিত করেন। এই বর্ণনার মধ্যে দিয়ে রাজার নৈতিক উৎকর্ষতার গুরুত্ব প্রকাশ পেয়েছে।

রাজা হঠাৎ করে কোন সিদ্ধান্ত নেন না, যাতে সাধারণ মানুষের কোন ক্ষতি হয় কিংবা তারা বিপথে পরিচালিত হয় কারণ, সামান্যতম ভুলেও মানুষের কপালে জোটে অশেষ যন্ত্রণা ও দুঃখভোগ। এই ভুল যাতে না হয় সেই কারণে তিনি ধর্মশাস্ত্র নিয়ে পড়াশোনা করেন এবং অন্যরাও যাতে পড়াশোনা করেন, সেইজন্য তিনি তাদের উৎসাহিত করেন। তিনি মনে করেন, ধর্মের পথেই মানুষকে একত্রিত করা সম্ভব এবং তাদের চারিত্রিক ও মানসিক উন্নতিসাধন সম্ভব। রাজা কোন ব্যক্তিগত যশ, খ্যাতি বা প্রতিপত্তির জন্য দেশ শাসন করেন না, আনন্দলাভের জন্যও করেন না, তিনি আইন-কানুন প্রণয়ন করে সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য দেশ শাসন করেন। তিনি মনে করেন, নৈতিকতা বা ধর্মের পতাকাতলে যদি সবাই আশ্রয় নেয়, তাহলে সবার মঙ্গল সাধিত হবে না। নাহলে দেশ বিপথে পরিচালিত হবে এবং নানা বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে।

যোগ্য রাজ কর্মচারীবৃন্দ: রাজাই কেবলমাত্র রাষ্ট্রের সমস্ত কিছু দেখভাল করতেন না। তিনি অন্যান্য মন্ত্রী ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের উপর নির্ভর করতেন। সেইজন্য মন্ত্রী ও উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিয়োগের ব্যাপারে তিনি যথেষ্ট সতর্ক থাকতেন। রাজা সেইসমস্ত পদের জন্য এমন সব কর্মচারী নিয়োগ করতেন, যারা সেই কাজের যোগ্য ও আগ্রহী এবং যারা কোনপ্রকার জুয়াখেলা বা মদ্যপানে আসক্ত নয়। বৌদ্ধদর্শনে এইরকমই চার ধরণের কর্মচারী নিয়োগের উল্লেখ আছে। যথা—

১) আধ্যাত্মিক কাজকর্মে নিয়োজিত ব্যক্তি;

২) মন্ত্রী ;

৩) বিচারপতি এবং

৪) অর্থমন্ত্রী।

রাজা এইসমস্ত কর্মচারী নিয়োগের জন্য সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। নাগার্জুন তাঁর *'রত্নাবলী'তে* প্রতিটি দপ্তরের প্রতিটি কর্মচারী নিয়োগের জন্য বিশেষ বিশেষ গুণাবলীর উল্লেখ করেছেন। তিনি প্রথম প্রকার কর্মচারীর গুণাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন—রাজা সেইসমস্ত ব্যক্তিকে প্রথম প্রকার কর্মচারী হিসেবে নিয়োগ করতেন, যারা আধ্যাত্মিক কাজকর্মে আগ্রহী ও নিষ্ঠাবান এবং যারা লোভ সংবরণ করে জ্ঞানের পথে পরিচালিত হয়ে তার যা যা করণীয় কর্তব্য সেগুলি যথাযথভাবে পালন করেন, তিনিই প্রথম প্রকার কর্মচারী হওয়ার যোগ্য। সেজন্য *'রত্নাবলী'তে* বলা হয়েছে—

"সর্বধর্মাধিকারেষু ধর্মাধিকৃতমুত্থিতম্।
অলুব্ধং পণ্ডিতং ধর্ম্যং কুরু তেষামবাধকম্।।"[৫]

দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে রাজা রাজনীতি সম্পর্কে সম্যক সচেতন, ন্যায়পরায়ণ পরিবারের প্রতি স্নেহশীল ও দায়বদ্ধ—এমন ব্যক্তিকে পছন্দ করতেন এবং তার ভিত্তিতে তিনি তাদের নিয়োগ করতেন। *রত্নাবলীতে* বলা হয়েছে—

"নীতিজ্ঞান্ ধার্মিকান্ স্নিগ্ধান্ শুচীন্ ভক্তানকাতরান্
কুলীনান্ শীলসম্পন্নান্ কৃতজ্ঞান্ সচিবান্ কুরু।।"[৬]

আর রাজা বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে সেইসমস্ত ব্যক্তিদের নিয়োগ করতেন যারা স্বাধীনচেতা, মননশীল, সহানুভূতিশীল, সম্পদশালী ও আবেগের দ্বারা তাড়িত না হয়ে নিজ সিদ্ধান্তে অবিচল, এমন চরিত্রবান ব্যক্তিদেরকেই রাজা বিচারক হিসাবে নিয়োগ করতেন। তাই রত্নাবলীতে বলা হয়েছে—

"অক্ষুদ্রাংস্ত্যাগিনঃ শূরান্ স্নিগ্ধান্ সংভোগিনঃ স্থিরান্।
করু নিত্যাপ্রমণ্ডাংশ ধার্মিকান্ দণ্ডনায়কান্।।"[৭]

রাজা অর্থমন্ত্রী হিসাবে তাদেরকে নিয়োগ করতেন যাদের চরিত্র ধর্মীয় পরিমণ্ডলে গঠিত। সৎ, নির্লোভ, ন্যায়পরায়ণ এমন চরিত্রবান ব্যক্তি যারা এই পদে যথার্থ পারদর্শিতার পরিচয় দেবেন তারাই অর্থমন্ত্রী পদের যোগ্য। রত্নাবলীতে বলা হয়েছে—

"ধর্মশীলান্ শুচীন দক্ষান্ কার্যজ্ঞান্ শাস্ত্রকোবিদান্
কৃতাবৃত্তীন সমান্ স্নিগ্ধান্ বৃদ্ধানধিকৃতান্ কুরু।।"[৮]

যখন রাজা কোন মন্ত্রী বা উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিয়োগ করতেন, তখন তাঁদের সামাজিক অবস্থান, সচেতনতা এবং তাদের নিজ নিজ দপ্তরের প্রতি কতটা দায়বদ্ধতা ও দক্ষতা আছে সে সম্পর্কে যাচাই করে নিতেন। এবং সে যদি তাঁর সমস্ত পাপ পরিহার করে উক্ত কাজের জন্য বদ্ধপরিকর হন, তবেই তিনি ঐ কাজের যোগ্য বলে বিবেচিত হতেন। এইসমস্ত সুদক্ষ কর্মচারী নিয়োগ করা সত্ত্বেও কার কী কী করণীয় সে সম্পর্কে সতর্ক করে দিতেন। রাজা কখনো অন্ধভাবে তাঁর কর্মচারী ও মন্ত্রীদের বিশ্বাস করতেন না, অর্থনৈতিক দপ্তরের প্রতি তো একদমই না। রাজা নিজেই সেই সমস্ত কাজের তদারকি করতেন। রাজা প্রত্যেক মাসে আয়-ব্যয়ের হিসাব নিতেন এবং রাজকোষ সমৃদ্ধির জন্য তাদের কার কী কী করণীয় ও দায়িত্ব সে সম্পর্কে উপদেশ দিতেন। তিনি সর্বদা তাঁর কর্মচারী ও মন্ত্রীদের সৎ ও ন্যায়পরায়ণ হওয়ার বিধান দিতেন, যাতে তাঁর রাষ্ট্রে অন্যায়ের অনুপ্রবেশ ঘটতে না পারে। সেইজন্য যে নিন্দার যোগ্য বা পাত্র তাকে তিনি তিরস্কার বা ভৎর্সনা করতে এতটুকু পিছপা হতেন না।

রাজার অনুসৃত পথেই কর্মচারীরা পরিচালিত হতেন। কাজেই, রাজা যদি অন্যায়ের পথ অনুসরণ করে তাহলে অপরাপর রাজকর্মচারীরাও বিপথগামী হবে। ফলে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে অন্যায়ের রাজত্ব শুরু করে। বিশৃঙ্খলা মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। কাজেই রাজাকে এখানে সূর্যের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। সূর্যের আলোয় যেমন গ্রহ, উপগ্রহ আলোকিত হয়, ঠিক তেমনি রাজার প্রতিভালোকে দেশের এমনকি বিশ্বের প্রতিটি মানুষও আলোকিত হয়।

রাজার কর্তব্য: রাজা যা সমাজের পক্ষে, দেশের পক্ষে ক্ষতিকর তাকে পরিহার করে নৈতিকভাবে রাষ্ট্রপরিচালনা করতেন। *অঙ্গুত্তর নিকায়*[৯]-এ ন্যায়পরায়ণ রাজাকে ধম্মিকস ধম্মরঞ্ঞো রাজা (dhammikassa dhammaranno raja) নামে সম্বোধনের দ্বারা যে ন্যায়পরায়ণতার পথ অনুসরণ করতেন, বা ন্যায়ের পথ অনুসরণ রাজার ধর্ম বলে বিবেচিত হত, তাকেই বোঝানো হয়েছে। রাজা অন্যায়ের পথ অনুসরণ করলে সমাজে বিশৃঙ্খলা; অপরাধ প্রবণতা দেখা দেবে। রাষ্ট্র চোর-ডাকাতদের স্বর্গভূমি হয়ে উঠবে। ফলে সমস্ত জনসাধারণ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগবে। এবং তারা ঘরবাড়ি ছেড়ে বনে জঙ্গলে আশ্রয় নিতে চাইবে। ফলে গ্রাম-শহর-নগর জনশূন্য হতে হতে ক্রমশঃ ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাবে এবং রাজা তাঁর নাম-যশ, খ্যাতি-প্রতিপত্তি হারাতে থাকবে। কেউ তাঁকে মান্য করবে না। সবাই তাঁর প্রতি আস্থা হারাবে এবং তাদের এই দুরাবস্থার জন্য দায়ী হবে। ফলে মৃত্যুর পর তিনি নরকে জন্মগ্রহণ করবেন।

কাজেই কোন দেশের সাফল্য বা প্রগতি নির্ভর করে একজন সুদক্ষ, ন্যায়পরায়ণ শাসনকর্তার উপর। যদি দেশনায়ক

বা রাজা ন্যায়পরায়ণ হন, তাহলে তা দেশের সমস্ত জনসাধারণের পক্ষে কল্যাণকর বা মঙ্গলজনক। আর রাজা যদি অন্যায়ের পথ অনুসরণ করে তাহলে এর বিপরীত ফল প্রসব করে। অন্যদিকে রাজা যদি ন্যায়ের পথ অনুসরণ না করে তাহলে সে শীঘ্রই তার রাজসিংহাসন হারায় এবং সমস্ত জনসাধারণ তার প্রতি বিরাগভাজন হয়। কিন্তু রাজা যদি ন্যায়ের পথ অনুসরণ করে, তাহলে সে সকল জনসাধারণের দ্বারা পূজিত হয়। তাই বৌদ্ধদর্শনে অন্যায়ের পথকে এড়িয়ে চলার বা পরিত্যাগ করার কথা বার বার বলা হয়েছে।

প্রশ্ন ওঠে : এই ন্যায়পরায়ণতার পথ কিভাবে রাজার দ্বারা অনুসৃত হবে? এবং তাঁর কর্তব্যকর্মগুলি কি কি? উত্তরে বলা যায়, রাজার উচিত সমস্ত প্রকার রাগ, দ্বেষ ও মিথ্যাচার বর্জন করা। আর যদি তিনি কোন অন্যায় কাজ করেন তাহলে তিনি অকপটে স্বীকার করবেন ও তার জন্য অনুতাপ করবেন। এবং ভবিষ্যতে এর যাতে আর পুনরাবৃত্তি না হয় তার জন্য তিনি অঙ্গীকারবদ্ধ হবেন। রাষ্ট্রের মঙ্গল বিধানের জন্য সদাসতর্ক দৃষ্টি রাখবেন। তিনি যা কিছু ভাল বা পুণ্য তা করার জন্য নিবেদিত প্রাণ হবেন এবং যা কিছু খারাপ বা পাপ তা বর্জনের জন্য সচেষ্ট হবেন। এবং তার এই পুণ্য কর্ম তথা কুশল কর্ম দ্বারা সকল পাপ বা অকুশল কর্মকে সহজে প্রতিহত করতে পারবেন।

একজন ন্যায়পরায়ণ রাজা তাঁর অপার করুণা, ভালোবাসা ও বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাবের দ্বারা সকল মন্দ অভিপ্রায় বা কুকর্ম তথা হিংসা, শত্রুতা প্রভৃতিকে নিমেষে জয় করতে পারবেন। রাজা তাঁর পিতা-মাতা, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা যার প্রতি যা কর্তব্য তা নিষ্ঠাসহকারে পালন করবেন। ফলে তাঁর ঐ আচরণের জন্য তিনি অন্যের কাছে শ্রদ্ধা-ভালোবাসার পাত্র হবেন। এবং তাঁর ঐ পুণ্যকর্মের দ্বারা তিনি মৃত্যুর পর স্বর্গে আরোহন করবেন।

জাতকে যে আদর্শবান ন্যায়পরায়ণ রাজার কথা বলা হয়েছে, সেই 'ন্যায়পরায়ণতা' বলতে 'চার' প্রকার মন্দকর্ম বা অকুশল কর্মকে পরিত্যাগ করার কথা বলা হয়েছে। যথা: ১) অপকার করার ইচ্ছা, ২) উত্তেজনা, ৩) লোভ এবং ৪) ভয়। সেইসঙ্গে 'দশ' প্রকার রাজধর্ম প্রতিপালন ও তার উন্নতিসাধনে সদা নিয়োজিত থাকা। সেগুলি হল— স্বহস্তে দান, নৈতিকতা, স্বাধীনতা, অগ্রগামিতা, কামনাহীন মানসিকতা, রাগ, দ্বেষ ও মোহ বর্জন, ধৈর্য্য ও ব্যুৎপত্তি অর্জন বা রক্ষা করা। প্রথমে উক্ত চারটি অকুশল কর্ম বা মন্দগুণকে পরিহারের কথা বলা হয়েছে। তারপর দশটি সৎগুণ বা ধর্ম পালনের কথা বলা হয়েছে। কেননা, প্রথমে অকুশল কর্মগুলিকে পরিহার করতে না পারলে সৎ ধর্মের যথার্থ অনুশীলন হবে না। তাই উক্ত চারটি অকুশল কর্ম রাজার চারিত্রিক উৎকর্ষ বিকাশের পথে অন্তরায়। চারটি অকুশল কর্মের মুলোৎপাটন করতে না পারলে সৎধর্মের বিকাশ সাধিত হবে না। এইভাবে অকুশল কর্মের বিনাশ ঘটিয়ে কুশল কর্ম তথা সৎগুণের বিকাশের বা পরিচর্যার মধ্য দিয়ে রাজা ন্যায়-পরায়ণ হয়ে উঠবেন। বৌদ্ধধর্ম মতে, রাজার ধারণা এবং তার কার্য পরিচালনা সর্বদাই ন্যায়নিষ্ঠ হবে—এমন দাবি অত্যন্ত স্পষ্ট।

অপরাধীদের প্রতি রাজার দৃষ্টিভঙ্গী বা কর্তব্য: রাজা সাম্য, মৈত্রী, করুণা প্রভৃতি আদর্শের দ্বারা পরিচালিত হলেও অপরাধীকে শাস্তিবিধান করতে বা কারাগারে বন্দী রাখতে এতটুকু পিছপা হতেন না। চোর, দস্যু প্রভৃতি অপরাধীগণ, তা সে যে বর্ণেরই হোক না কেন, দুষ্কৃতিকে যোগ্য শাস্তি দেওয়াই ছিল রাজার কর্তব্য। তিনি এখানে কোনরকম দ্বিচারিতা করতেন না। এবং কোন অপরাধীকে বিনা অপরাধে কারাগারে বন্দী রাখতেন না। তাঁর মৈত্রী, করুণার আদর্শ মানবজাতির সীমানা অতিক্রম করে সমস্ত অমানব জীবের প্রতিও বর্ষিত হয়েছিল। এমনকি যারা গুরুতর অপরাধে অপরাধী, সেইসমস্ত অপরাধীদের পাপের পঙ্কিল গহ্বর থেকে তুলে এনে ন্যায়ের পথে তথা ধর্মের পথে সামিল করেছিলেন। যেমন— ভগবান বুদ্ধ অঙ্গুলিমাল নামক এক কুখ্যাত নরহত্যাকারী খুনী অপরাধীকে ফিরিয়ে না দিয়ে তার প্রতি ভালোবাসা, সহিষ্ণুতা ও বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। অঙ্গুলিমাল বুদ্ধের অপার করুণার সংস্পর্শে এসে তাঁর অতীতের সমস্ত পাপ তথা অপরাধকে নির্দ্বিধায় স্বীকার করেছিলেন।

বুদ্ধের করুণাস্পর্শে তার পাষাণহৃদয় কোমল কুসুমাস্তীর্ণ হয়ে ওঠে, নিষ্ঠুর দস্যু খড়্গ ফেলে তুলে নেয় সন্ন্যাসীর গৈরিক বসন। তারপরে ক্রমে হয় অর্হৎলাভ, এবং শেষে নির্বাণ। বিস্ময়াবিষ্ট ভিক্ষুরা একদিন বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করলেন—এ কি করে সম্ভব হল? উত্তরে বুদ্ধ বললেন:

"যস্স্ পাপং কতং কম্মং কুসলেন পিথীয়তি।
সো ইমং লোকং পভাসেতি অব্ভা মুত্তো'ব চন্দিমা।।"[১০]

অর্থাৎ, যার কৃত পাপকর্ম কুশল কর্ম দ্বারা আবৃত হয়, সে মেঘমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় জগৎ- কে আলোকিত করে। কাজেই কর্মফলের হাত থেকে মানুষের নিষ্কৃতি নেই ঠিকই, কিন্তু সুকর্মের দ্বারা অনেক দুষ্কর্মকে মুছে ফেলা যায়। তার থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় এইভাবে সৎকর্মের দ্বারা অসৎ কর্মের ফল যিনি ক্ষয় করেন তার মালিন্য যুক্ত দিব্যজ্ঞানে পরিপূর্ণ চিত্ত জগৎবাসীর হৃদয়কে উদ্ভাসিত করে।

সেইসময় যে রাজা বুদ্ধের এই আদর্শের দ্বারা গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হতেন, তিনি কখনও অপরাধীকে ঘৃণার চোখে না দেখে আপন করে নিয়ে তার অপরাধ শুধরে দেওয়ার চেষ্টা করতেন এবং ন্যায়ের পথে নিয়ে আসতেন। কিন্তু এরজন্য অপরাধীর কোন মৌলিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করতেন না।

রাজা বন্দীদের প্রতিও সাম্য, মৈত্রী ও করুণার আদর্শ প্রদর্শন করতেন। প্রত্যেকদিন অথবা সপ্তাহের পাঁচদিন দুর্বল কয়েদীদের কিছুক্ষণের জন্য কারাগারের বাইরে যাওয়ার ব্যবস্থা করতেন, বাকি কয়েদীদের চরিত্র সংশোধনের জন্য বিভিন্ন সংশোধনাগারে পাঠানো হত।[১১] যখন তারা কারাগারে বন্দী থাকত, তখনও তাদের বেঁচে থাকার জন্য যে সমস্ত অত্যাবশ্যকীয় জিনিসপত্র তথা খাদ্য, বস্ত্র, ঔষধপত্রাদি থেকে বঞ্চিত করা হত না। কাজেই, কারাগার থেকে ছাড়া পাওয়ার আগে পর্যন্ত তাদের যাতে কোনরকম অসুবিধা না হয়, সেজন্য নাপিতের ব্যবস্থা, পানীয় জল, স্নানের জল, খাদ্য, বস্ত্র ও প্রয়োজনীয় ঔষধ পত্রাদির সুব্যবস্থা থাকত। এদিক থেকে রাজার মানবিক মূল্যবোধ প্রকাশিত হয়েছে। কেননা, দাগী অপরাধী-ও যে মানুষ এবং তাকে সুযোগ দিলে সেও যে সমাজের মূলস্রোতে ফিরে আসতে পারে, তারই প্রচেষ্টা রাজা আজীবন করে গেছেন।

সম্রাট অশোকের রাজ্যশাসন প্রণালী: এইরকমই একজন বৌদ্ধ ধর্মানুরাগী, ন্যায়পরায়ণ রাজার পরিচয় পাওয়া যায়— তিনি হলেন সম্রাট অশোক। তিনি দিগ্বিজয়-নীতি পরিহার করে ধর্ম-বিজয়নীতি গ্রহণ করেন এবং এই ধর্মনীতির জন্যই তিনি পৃথিবীর ইতিহাসে স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে আছেন। খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম বা খ্রীষ্টোত্তর প্রথম শতকের মধ্যেই অশোক 'ধর্মরাজা' বলে প্রতিষ্ঠিত হন। চতুর্দশ শিলালিপিতে কথিত আছে অশোকের রাজত্বের আরম্ভকালে, কলিঙ্গ স্বাধীন রাজ্য ছিল। অশোক স্বরাজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে কলিঙ্গ আক্রমণ করে যুদ্ধে জয়লাভ করেন। যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ মানুষ হতাহত ও বন্দীকৃত হয় এবং সমগ্র দেশ ছারখার হয়ে যায়। এই ভীষণ ঘটনায় রাজার মনে এমনি আঘাত লেগেছিল যে সেই থেকে তিনি দিগ্বিজয়ের আকাঙ্খা পরিত্যাগ করে, ধর্মরাজ্য বিস্তারে ব্রতী হলেন।

কলিঙ্গ বিজয়ের অল্পকালের মধ্যে, খ্রীষ্টপূর্ব ২৫৯অব্দে, অশোক বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন। প্রথমে গৃহস্থ উপাসকরূপে দীক্ষিত ও তারপরে বিধিমত সংঘভুক্ত হয়ে, বৌদ্ধধর্ম প্রচারে তিনি প্রতিনিয়ত নিযুক্ত ছিলেন। তাঁর অদম্য উৎসাহ ও উদ্দীপনায় বৌদ্ধধর্মের বিকাশ লাভ হয়, এবং তিনি এত চৈত্য, এত স্তূপ ও অন্যান্য এত প্রকার কীর্তি-নিকেতন স্থাপন করেন যে, সেইসকল চিহ্ন দু'হাজার বছরের পরেও বিলুপ্তি হয়নি। মগধ রাজ্যে প্রায় চৌত্রিশ হাজার বৌদ্ধ-ভিক্ষু প্রতিপালিত হত, এবং তাদের বাস উপযোগী বিহারগুলি এমনিই ভরে উঠেছিল। তিনি সমগ্র ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম প্রচারে ব্রতী হয়েছিলেন, কেবলমাত্র নিজের রাজ্যে নয়, পররাজ্যে ও দেশান্তরে ধর্মযাজক প্রেরণ করেন।

অশোক বৌদ্ধধর্মকে কোন বিশেষ সম্প্রদায় সীমার মধ্যে আবদ্ধ করে রাখেননি, বিশ্বজনীন ধর্মরূপে দেশ-দেশান্তরে প্রচার করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। খ্রীষ্টপূর্ব ২৫৭ অব্দ হতে পঁচিশ বছরের মধ্যে তাঁর যেসকল শিলালিপি প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল তার মধ্যে চতুর্দশ শিলালিপিটি অগ্রগণ্য। এ থেকে সম্রাট অশোকের ধর্মবিশ্বাস এবং অনুষ্ঠান সম্পর্কে কিছু পরিমাণে জানতে পারা যায়।

শিলালিপি: প্রথম অনুশাসন হল জীবহত্যা নিবারণ। এই অনুশাসন অনুসারে সম্রাটের রন্ধনশালায় যে অসংখ্য জীবহত্যা হত তা নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। এমনকি যজ্ঞে কিংবা পর্বাদিতেও জীবহত্যা প্রথা নিষিদ্ধ করা হয় (খ্রী: পূ: ২৫৬)।

দ্বিতীয় শীলানুশাসনের বক্তব্য এই যে, মনুষ্য ও পশুদিগের হিতার্থে বা, মঙ্গলার্থে ঔষধালয় স্থাপন, কূপ খনন, বৃক্ষাদি রোপণ ইত্যাদি।

তৃতীয় শীলানুশাসনের উপদেশ এই যে, পিতৃমাতৃভক্তি, ব্রাহ্মণ-শ্রমণে দান, প্রাণীহিংসা বর্জন, আয়-ব্যয়ে সংকোচ, এইসকল অনুশাসন প্রচার করবার জন্য পাঁচ বৎসর অন্তর রাজকর্মচারীগণ বিভিন্ন প্রদেশ পর্যটন করবেন।

চতুর্থ অনুশাসন হল কর্তব্যপালন, যুদ্ধ অভিনয়ের পরিবর্তে ধর্মসম্বন্ধীয় শোভাযাত্রা, জীবহত্যা ও অশোভন আমোদ-প্রমোদ নিবারণ, আত্মীয়-স্বজন, সাধু-সন্ন্যাসী, শ্রমণ ও ব্রাহ্মণের প্রতি সদ্ব্যবহার, সম্রাটের উত্তরাধিকারী বংশধরগণ, এই অনুশাসন পালন করে এই সকল ধর্মানুষ্ঠান বিষয়ে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করবেন, এবং সৎ পথে থেকে, অপরকে সদৃষ্টান্ত প্রদর্শন ও ধর্মোপদেশ দান করবেন।

পঞ্চম শীলানুশাসনের উপদেশ এই যে, সৎকর্ম কঠিন এবং পাপকর্ম অনায়াস সাধ্য। এইসকল অনুশাসন কার্যে পরিণত হল কিনা, তার তত্ত্বাবধানের জন্য ধর্মাধিকারী নিযুক্ত হবে। তাঁরা যে কেবলমাত্র ধর্ম উপদেশ দিবেন, তা নয়, অধিকন্তু অন্যায়-অবিচারের প্রতিবিধান, বিপন্নও বার্ধক্য পীড়িতদের দুঃখমোচন এবং বহু পরিবারের ভারগ্রস্ত ব্যক্তিদের সহায়তা করাই তাঁদের বিশেষ কর্তব্য। রাজধানী পাটলীপুত্র এবং প্রধান প্রধান নগরে রাজপরিবারভুক্ত অন্তঃপুরবাসীদিগের দৈনিক জীবনযাত্রার প্রতি তাঁরা দৃষ্টি রাখবেন।

ষষ্ঠ অনুশাসনের বক্তব্য এই যে, রাজকর্মচারীদের শাসনকার্যে তৎপরতা, দীর্ঘসূত্রীতা বর্জন, বিলম্ব নিবারণের বা, দূরীকরণের জন্য সম্রাট সর্বদাই চরমুখে সংবাদ সংগ্রহের জন্য প্রস্তুত থাকতেন। আহারে, বিহারে, অন্তঃপুরে, রাজসভায় কিংবা, প্রমোদ উদ্যানে যখন যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন, কখনোই তাদের প্রবেশ নিষেধ ছিল না। অশোক বলেন—"এইভাবে লোকহিত সাধন করে যাতে মানবজীবনের ঋণমুক্ত হতে পারি, এই আমার নিয়ত চেষ্টা।"[১১]

সপ্তম অনুশাসনের উপদেশ এই যে, দানশীলতা সকলের পক্ষে সুসাধ্য নয়, কিন্তু ইন্দ্রিয়সংযম, কৃতজ্ঞতা, চিত্তশুদ্ধি, কর্তব্যনিষ্ঠা— এইসকল অত্যাবশ্যক ধর্ম সকলেরই পালনীয়।

অষ্টম অনুশাসনের বক্তব্য এই যে, মৃগয়া কিংবা আমোদ-প্রমোদ উদ্দেশ্যে দেশভ্রমণের পরিবর্তে দরিদ্রে দান, ধর্মশিক্ষা ও আলোচনার নিমিত্ত তীর্থযাত্রা করণীয়। এইসকল স্থানে সম্রাট বিশেষ করে সাধু সন্ন্যাসীদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার এবং তাঁদেরকে দান করবেন।

নবম অনুশাসনের বক্তব্য এই যে, ধর্মানুষ্ঠান ইহকাল-পরকালের সুখের সাধনা। গুরুভক্তি, জীবে দয়া, শ্রমণ ব্রাহ্মণে উপযুক্ত দান, দাস-দাসীর প্রতি ন্যায়-আচরণ, ইহাই ধর্মানুষ্ঠান।

দশম অনুশাসন নিম্নলিখিত দুটি বচন হতে এই অনুশাসনের সারমর্ম জানতে পারা যায়—

"ক্ষুরস্যধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।

যাবজ্জীবেন তৎ কুর্য্যাৎ যেনামৃতং সুখং নয়েৎ।।"[১২]

একাদশ অনুশাসনের মূল বক্তব্য প্রকৃত ধর্ম কি? পিতৃ-মাতৃভক্তি, দাসবর্ণ সংরক্ষণ, আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, ব্রাহ্মণ শ্রমণে দান, জীবহত্যা থেকে বিরতি এভাবে চলে মানব ইহকালে পুণ্য ও পরকালে সুগতি লাভ করে।

দ্বাদশ অনুশাসনে বলা হয়েছে, ধর্মমতে ঔদার্য। স্বধর্মের স্তুতিবাদ ও পরধর্মের অকারণ নিন্দাবাদ করবে না। সকল ধর্মের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবে। এই অনুশাসনে নির্দেশ করা হয়েছে যে, এই উদ্দেশ্যে নারীদিগের প্রতি দৃষ্টি রাখবার জন্য বিশেষ পরিদর্শক নিযুক্ত করা হবে।

ত্রয়োদশ অনুশাসন, এই সকল অনুশাসনের মধ্যে ত্রয়োদশ শিলালিপি সর্বপ্রধান বলে গণ্য হতে পারে। কারণ, কলিঙ্গ বিজয় ও তার আনুষঙ্গিক হত্যাকাণ্ড বর্ণনা হতে এর আরম্ভ।

দেবানামপ্রিয়, প্রিয়দর্শী সম্রাট অশোক বলেছিলেন—"আমার রাজ্য অভিষেকের অষ্টম বর্ষে কলিঙ্গ দেশ বিজিত হয়, এই যুদ্ধে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার ব্যক্তি বন্দীকৃত ও লক্ষাধিক হত হয়, এবং ততোধিক দৈব-দুর্বিপাকে প্রাণত্যাগ করে।"[১৩]

কলিঙ্গ বিজয়ের অব্যবহিত পরেই সম্রাটের শুভ বুদ্ধি জাগ্রত হয়, যুদ্ধের ভীষণ হত্যাকাণ্ড তাঁর মনে অনুশোচনার উদ্রেক কর। "বিশেষ ক্ষোভের কারণ এই যে, ব্রাহ্মণ, শ্রমণ, সাধুসন্ন্যাসী ও অপরাপর গৃহস্থগণ যাঁরা যুদ্ধের সঙ্গে আদৌ জড়িত নয়—তাঁরাও এই ঘটনাচক্রে দুঃখভাগী হয়ে থাকেন।" এই ঘটনায় অশোক মর্মাহত হন। তাঁর মনে আমূল পরিবর্তন হয়েছিল। তাঁর দেবানাম প্রিয় অনুজ্ঞা সকল যেখানে যেখানে প্রচারিত, সেখানে সেখানে প্রজাবর্গ আকৃষ্ট হয়ে ধর্মগ্রহণ করেছিল। তাঁর মনে এই বোধ জাগরিত হয়েছিল যে—দেশ বিজয় বহুপ্রকারের হতে পারে, কিন্তু ধর্মের জয় সর্বাপেক্ষা আনন্দজনক। এই বিজয় শ্রেষ্ঠ এবং বাঞ্ছনীয়। আমার উত্তরাধিকারী এবং বংশধরগণ যাতে দিগ্বিজয়ের উচ্চাভিলাষ ত্যাগ করে ধর্মরাজ্য বিস্তারে উদ্যোগী হন সেই অভিপ্রায়ে এই অনুশাসন প্রচারিত হল।"

চতুর্দশ অনুশাসনের বক্তব্য এই যে, সম্রাট প্রিয়দর্শীর আদেশানুক্রমে এইসকল শিলালিপি রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশে, বারবার উপস্থাপিত হয়েছিল। যদি এতে কোন ভ্রম প্রমাদ হয়ে থাকে, তবে তা মার্জনীয়। এই চতুর্দশ অনুশাসন ভারতের নানাস্থানে প্রচারিত হয়েছিল।

উক্ত চতুর্দশ শিলালিপির মত সপ্ত স্তম্ভানুশাসনও ঐতিহাসিক ক্ষেত্রে সুবিদিত।[১৪]

সপ্ত স্তম্ভলিপি : ১) সম্রাট অশোকের রাজ্যাভিষেকের ছাব্বিশ বৎসরে এই অনুশাসন স্তম্ভের প্রতিষ্ঠা হয়। ধর্মানুরাগ, ধর্মনিষ্ঠা, আত্ম-পরীক্ষা, সাধুচেষ্টা, এইসকল সাধনা ছাড়া ঐহিক পারত্রিক কল্যাণ সাধিত হয় না। তিনি বলেন সে যাইহোক, আমার অনুশাসন প্রভাবে এই ধর্মানুরাগ উদ্দীপ্ত হয়েছে এবং দিন দিন বর্ধিত হবে। আমার ধর্মাধ্যক্ষগণ ছোট বড় যেই হোক, আমার আজ্ঞাবহ থেকে প্রজাবর্গকে—এই চঞ্চল-চিত্ত লোকসকলকে সৎপথে নিয়ে যেতে সচেষ্ট হবে।

২) দয়া, দান, সত্য, চিত্তশুদ্ধি, পুণ্যানুষ্ঠান এবং পাপাচরণ হতে বিরতি' — ইহাই ধর্মের লক্ষণ। অশোক বলেন, ধম্ম হল ন্যূনতম পাপ, অনেক পুণ্য, করুণা, উদারতা, সত্যবাদিতা ও বিশুদ্ধতা।

৩) তৃতীয় স্তম্ভানুশানে তিনি সুকাজ ও কুকাজের মধ্যে পার্থক্য করার চেষ্টা করেছেন।[১৫]

লোকে সর্বদা নিজের ভাল দেখে, কিন্তু কি মন্দ তা বিবেচনা করে না। এটি ঠিক নয়, ভালমন্দ বিচার করা কর্তব্য— রাগ, দ্বেষ, দম্ভ, অহঙ্কার, ঈর্ষা এই সকল পাপ থেকে বিরত থাকবে। দেখবে একপথে ঐহিক সুখ ও অপর পথে পারত্রিক মঙ্গল সাধিত হবে।

৪) শাসনকর্তাদের অধিকার ও কর্তব্য নিরূপণ: সম্রাট অশোক বলেছিলেন— আমি আমার শাসনকর্তাদিগকে দণ্ড ও পুরস্কার বিধানে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছি। যাতে তারা নির্ভীক চিত্তে আপন কর্তব্য সাধন করতে পারে, তাঁরা প্রজাবর্গের সুখ-দুঃখের

কারণ অনুসন্ধান করে, তাদের সুখবর্দ্ধন ও দুঃখ মোচন করতে যত্নশীল হবে। নিজ নিজ অধীনস্থ কর্মচারী দ্বারা তাদের ঐহিক-পারত্রিক হিত সাধনে নিযুক্ত থাকবে।

অশোক বলেছিলেন—পিতা যেমন বালককে সুদক্ষ রক্ষকের হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকেন, তেমনি আমার কর্মাধ্যক্ষদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে, তাদেরকে প্রজার হিতার্থে বা মঙ্গলকামনার্থে নিয়োগ করলাম।

৫) প্রাণীহত্যা ও পীড়ন নিবারণের ব্যবস্থা: কোন প্রাণীকে আহার্যরূপে ব্যবহার করা যাবে না। পূর্ণিমা ও অন্যান্য তিথিতে মৎস্যাদি ধরা পর্যন্ত নিষিদ্ধ।

বন্দীগণের মুক্তিদান— তিনি বলেন আমার ছাব্বিশ বৎসর রাজত্বকালের মধ্যে পঁচিশবার বন্দীদিগের কারামোচনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।[১৬]

৬) সম্রাট অশোকের উপদেশ এই যে —স্বধর্ম পালন করাই মনুষ্য মাত্রেরই কর্তব্য। তাদের ধর্ম যাইহোক, সকল সম্প্রদায়ের সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করা আমার আন্তরিক ইচ্ছা।

৭) ধর্মপ্রচারের নিয়ম: দুইধারে ছায়াপ্রদানকারী বৃক্ষরোপণ, কূপ খনন, পান্থশালা নির্মাণ, ধর্মাধিকারী নিয়োগ।

সৎপাত্রে দান—কেবলমাত্র আমার নিজস্ব দান নহে, যা যা আমার মহিষীদিগের দান, তা যোগ্যপাত্রে বিতরিত হোক, এই আমার আদেশ। প্রজাদের কল্যাণের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা প্রবর্তনে এবং ধম্ম-র নীতির ব্যাপক প্রচারে তিনি যে সাফল্য লাভ করেছিলেন তার উল্লেখ তিনি এই অনুশাসনে উল্লেখ করেছেন।

সম্রাট অশোক বলেন— আমার অনুশাসনগুলি যাতে শাশ্বতকাল পর্যন্ত স্থায়ী হয় সেই উদ্দেশ্যে আমি এই সকল স্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করে দিলাম।

উপরে সম্রাট অশোকের শাসনব্যবস্থা ও কতকগুলি সুকীর্তির কথা বর্ণিত হল এই কারণে যে, পরবর্তীকালে যেসব রাজবংশ সুসংবদ্ধভাবে রাজত্ব করে গেছেন তাঁরা ও অশোকের জনহিতকর কার্যপ্রণালীর অনুসরণ করেছেন এবং ধর্মের শিল্পকলার ও ব্যবসা-বাণিজ্যের পৃষ্ঠপোষকতা করে গেছেন। অশোক শুধু তাঁর রাজকার্য সম্পাদনের মধ্য দিয়ে ইতিহাস বিখ্যাত হয়ে যান নি। মানুষ সে যতই নির্মম, পাপী, অসৎ ও যুদ্ধপ্রিয় হোক না কেন, সে যে ধর্মের পথে, সত্যের পথে আসতে পারে সম্রাট অশোক তার নিজের জীবন দিয়ে দেখিয়ে গেছেন। যে রাজ্যভিষেকের সময় ক্ষমতার মোহে অন্ধ হয়ে রক্তনদী বইয়ে দিয়েছিল, সেই পরবর্তীকালে বৌদ্ধধর্মের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে শান্তি, মৈত্রী ও করুণা ধারা দিকে দিকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল। প্রজাদের সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য ও কল্যাণ বর্ধনে নিজেকে সঁপে দিয়েছিল। এইভাবে রাজ্যবিস্তারের কামনাত্যাগ করে প্রজাদের হিতার্থে বা, মঙ্গলার্থে নিজেকে সর্বদা নিয়োজিত রেখে যে অনন্য কীর্তি স্থাপন করে গেছেন তা চিরকাল পৃথিবীর ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে।

সামগ্রিক আলোচনার পরিশেষে বলা যায়, বুদ্ধের দৃষ্টিতে রাজা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হলেও তিনি অধঃস্তন কর্মচারী তথা মন্ত্রীদের মতামতকেও গুরুত্ব দিতেন। তিনি এমন কোন নীতি নির্ধারণ করতেন না যা প্রজাদের ক্ষতিসাধন করে। প্রজা কল্যাণই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য এবং ধর্মের পথে 'বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায়'- নীতি নির্ধারণ করেন। দণ্ড বা শাস্তি বিধানেও তিনি কোন বৈষম্য প্রদর্শন করতেন না। চোর-ডাকাত প্রভৃতি— অপরাধীগণ তা সে যে বর্ণের বা ধর্মেরই হোক না কেন যোগ্য শাস্তি ভোগ করবে। রাজা অপরাধীদের শাস্তিবিধান করলেও কঠোরতম বা চরম শাস্তিরূপে প্রাণদণ্ডকে সমর্থন করেন নি। এইদিক দিয়ে রাজা শুধু তার রাজ কর্তব্যকেই পালন করেন নি, অধিকন্তু প্রজাদের প্রতি তাঁর অপার মমত্ববোধ ও করুণা বর্ষিত হয়েছে। কেউ আপত্তি করে বলতে পারেন—রাজা কেবল নিয়মতান্ত্রিক প্রশাসকমাত্র, যে কেবল নিজের যশ-খ্যাতি ও প্রতিপত্তির আশায় দেশ-শাসন করেন, সমাজের হিতসাধনের জন্য নয়। এইদিক দিয়ে রাজাকে স্বার্থপর বা, ব্যক্তিকেন্দ্রিক বলা

যেতে পারে। উক্ত আপত্তির উত্তরে বলা যায়, রাজা তো নিয়মতান্ত্রিক বা নিয়মসর্বস্ব নয়ই, অধিকন্তু তিনি আধ্যাত্মিক বা ধর্মীয় আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায় বা, বহুজনের সুখের জন্য দেশশাসন করতেন। রাজার অনুশাসন ছিল সমাজের কল্যাণ সাধন করা, আর 'ধর্ম' ছিল ঐ লক্ষ্যে পৌঁছানোর পথ। ধর্মপথে উক্ত লক্ষ্যে পৌঁছাতে চেয়েছিলেন বলে একদিকে তিনি যেমন অন্যায়কে সহজে প্রতিহত করতে পারতেন, তেমনি সাধারণ মানুষের কাছেও তিনি শ্রদ্ধার পাত্র হিসেবে বিবেচিত হতেন। কোন দেশ প্রগতিশীল হবে যদি সেই দেশের দেশনায়ক সৎ ও ন্যায়পরায়ণ হয়। কারণ, দেশনায়কের অনুসৃত পথে নাগরিকরা পরিচালিত হয়, দেশনায়ক যদি দুর্নীতিপরায়ণ ও লোভের বশবর্তী হয়ে দেশ শাসন করে তাহলে সেই দেশের কপালে জোটে অসম্ভব দুর্গতি। কিন্তু এখানে আমরা যে রাজার পরিচয় পাই তিনি আসলে সত্য ও ন্যায়পরায়ণতার আদর্শ প্রতিমূর্তি। ধর্ম ও ন্যায়বোধ ছিল তার সকল কাজকর্মের মূল চালিকাশক্তি। সেখানে লাভালাভ ও মোহের প্রশ্ন অবান্তর। তিনি সকল ক্ষুদ্র স্বার্থের বন্ধন ছিন্ন করে হয়ে উঠেছেন সকল মানুষের জনপ্রতিনিধি। ফলতঃ একদিকে তিনি যেমন হয়ে উঠেছিলেন প্রজার সুখে সুখী তেমনি প্রজার দুঃখেও সমান দুঃখী। কাজেই তাঁর এই প্রজাবৎসল মানসিকতা, বিচক্ষণতা, কর্তব্যপরায়ণতা, সমদর্শী মনোভাব, জনকল্যাণমুখী কার্যকলাপ ও অপার মমত্ববোধ একদিকে তাঁকে যেমন মাটির কাছাকাছি এনে দিয়েছে তেমনি নির্বাণ তথা মুক্তিপথেরও পথিক করে তুলেছে।

তথ্যসূত্র ও টীকা

১. *দীঘনিকায়*-III, PP.84-95
U.N.Ghosal, *A History of Indian Political Ideas*, Oxford University Press, 1959, P.62
২. *সুত্তনিপাত*-III, PP.84-95
U.N.Ghosal, *A History of Indian Political Ideas*, Oxford University Press, 1959, P.67
৩. *সংযুক্তনিকায়*-I, PP. 41-42, ঐ
৪. *বিভঙ্গ*, 422, ঐ
৫. *রত্নাবলী*-IV, ২৭
৬. *রত্নাবলী*-IV, ২২
৭. *রত্নাবলী*-IV, ২৪
৮. *রত্নাবলী*-IV, ২৫
৯. *অঙ্গুত্তর নিকায়*-III, P. 149
U.N.Ghoshal, *A History of Indian Political Ideas*, Oxford University Press, 1959, P.69
১০. *ধম্মপদ*, গাথা-১৭৩
১১. সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, *বৌদ্ধধর্ম*, মহাবোধি বুক এজেন্সি, পুনর্মুদ্রণ: ২০১০, পৃ. ১৩৯
১২. ঐ, পৃ. ১৪০
১৩. ঐ
১৪. ঐ, পৃ. ১৪৩
১৫. রোমিলা থাপার, *অশোক ও মৌর্যদের পতন*, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা, পৃ.১৮৬
১৬. সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, *বৌদ্ধধর্ম*, মহাবোধি বুক এজেন্সি, পুনর্মুদ্রণ: ২০১০, পৃ. ১৪৪